নীলনির্জন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওগো গরবিনী,সত্রে তোমার
যত উপবাসী নিত্য জুটে,
আমি তো তাদের একজন নই,
চাব না ভিক্ষা চরনে লুটে।
তা ব’লে ভেব না ক্ষুধা নেই মম,
জানি না অভাব নিষ্ঠুরতম,
আশা-নিরাশার দোদুল দোলায়
নামিনি পাতালে, উঠিনি কূটে ।
প্রতিদানহীন ডান নিতে তবু
আসিনি লোভীর সঙ্গে জুটে ।।

বহুবার বিধি বহু দিক হতে
বহু বঞ্চনা করেছে মোরে
খনে খনে তবু অলোকের স্নেহে
জীবন আমার গিয়েছে ভ’রে ।
কপট পাশায় পৃথিবীপতিরে
বনে পাঠায়েছে অবনত শিরে ;

দ্বৈরথরণে তারই মাহাত্ম্য
দিয়েছে আবার দ্বিগুন ক’রে।
শাপ ও আশিস্, সুধা আর বিষ
একত্রে বিধি বিতরে মোরে ।।

যদিও আজিকে সম্পদহীন
পথে পথে ঘুরি মৌন দুখে,
তবু অরূপের অক্ষয় স্মৃতি
সঞ্চিত আছে আমারই বুকে ।
আমি জানি কোথা কোন পল্বলে
সোনার সবিতা তিলে তিলে গলে,
বকুলবনের কোন্ কোণে শশী
দেখে মুখছবি মুকুরে ঝুঁকে ।
তারার মেলায় যে গণে প্রহর,
অতন্দ্রিত সে আমারই দুখে ।।

যদিও আজিকে বীত নিঃশ্বাস,
দীর্ণ আমার মোহন বেণু,
তবু হয়েছিল সে-সুরে সিদ্ধি,
যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেনু
ফিরে আসে গোঠে গোধূলিবেলায়,
চপলতা জাগে রাধিকার পায়,
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখায়
উড়ে এসে লাগে সৃজনরেণু ।
দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে
শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু ।।
যেই বিভিষিকা ছায়ার সমান
ফেরে অহরহ রূপের পাছে,

বহুবার তার আকার,প্রকার
ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে।
আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে ।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে ।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে ।।

খিন্ন হলেও আমার নয়ন
দিব্যদৃষ্টি তাতেই রাজে।
আমি জানি কেন নিগূঢ় বেদনা
নবপ্রণয়ীর মরমে বাজে।
নির্মিত আমি পরশ পাথরে;
মৃন্ময়ী হয়য় সোনা মোর করে ।
জানি উর্বশী চিরযৌবনা
কারে পরখিতে জরতী সাজে ।
বুঝি আমি কোন্ নিগম অর্থ
ইতরের অপভাষায় রাজে ।।

তোমার প্রাণের পরতে পরতে
যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে,
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝংকৃত আজ সে অনুনাদে।
অচিন পথের দূতরূপে তাই
প্রতিদিন এসে দুয়ারে দাঁড়াই ;
অভাবনীয়ের আহ্বান নিয়ে
অবক নয়ন তোমায় সাধে ।

নিত্য জ্বালায় কলুষকালিমা
জানি ; তাই হিয়া দরদে কাঁদে ।।

নিয়ে যাবো আমি তোমারে যে –পথে,
সে-পথে একাকী যায় না যাওয়া ;
পদে পদে তার কাঁটার আঘাত,
পাকে পাকে হাঁকে পাগল হাওয়া ;
হিতবুদ্ধির তড়িৎ ভ্রুকুটি
দূরদিগন্তে উঠে ফুটিফুটি;
ভ্রমে আশেপাশে হিংসালু শিবি ;
পশ্চাতে আর যায় না চাওয়া ।
সর্বহারার দুর্গম পথে
নিয়ামক বিনা যায় না যাওয়া।।

তবু পরিহরি বিত্তের মোহ
রিক্ত অয়নে দাঁড়াও নেমে।
তোমার ত্যাগের দাম ধ'রে দেব
অনির্বচন অমর প্রেমে ;
নিয়ে যাব যেথা নেই দেশ-কাল,
নেই ব্যাধি-জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল,
সত্য যেখানে স্বপ্নসুষমা,
ভেদ নেই যেথা সীসায় হেমে।
স্বার্থপরের অর্ঘ্যের লোভ
ত্যাগ ক'রে এসো নিভৃতে নেমে ।।

মোদের সমুখে নন্দনবন
আগলমুক্ত আবার হবে ;
রবে পদতলে অলকানন্দা,

ইন্দ্রধনুর তোরণ নভে ।
রচি ফুলশেজ চ্যুত পারিজাতে
পীযূষপেয়ালা তুলে দেব হাতে ।
উধাও মলয় দ্যুলোকে-ভূলোকে
মোদের প্রেমের কাহিনী কবে।
মোর অসাধ্যসাধনে, মানবী,
নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে।

অন্ত্য রঙ্গ

হারে-রে রঙ্গিলা, তোর কথার টানে টানে
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই, সমস্ত রাতভোর
কোন্ কামনার আগুন ছুঁয়ে স্বপ্ন দেখি তোর,
কোন্ দুরাশার, রঙ্গিলা? তুই হঠাৎ কোনোখানে
না ভাঙলে না-দেখার দেয়াল, মিথ্যে এ তোর খোঁজে
দিন কাটানোল বাঁধন খোলার স্বপ্নে দিয়ে ছাই
ঘর ছাড়িয়ে পরিয়ে দিলি পথের বাঁধন, তাই ব্যর্থ হল রঙ্গিলা তোর সমস্ত রঙ্গ যে।

হারে-রে রঙ্গিলা, তোর গানের টানে টানে
পার হয়েছি দুঃখ, তবু কেমন করে ভুলি
আজও আমার জীর্ণ শাখায় সুখের কুঁড়িগুলি
পাপড়ি মেলে দেয়নি, আমার শুকনো মরা গাঙে
তরঙ্গ নেই, হৃদয়ধনুর দৃপ্ত কঠিন ছিলা
দিনে দিনে শিথিল হল; রঙ্গিলা, এইবার
অন্ধকারকে ছিন্ন করে ফুলের মন্ত্র আর
ঢেউয়ের মন্ত্র শেখা আমায়, রঙ্গিলা রঙ্গিলা!
হারে-রে রঙ্গিলা, তোর সময় নিরবধি

> রঙ্গও অনন্ত, আমার সময় নেই যে আর,
> কে আমাকে শিখিয়ে দেবে পথের হাহাকার
> কী করে হয় শান্ত, আমার প্রাণের শুকনো নদী
> উজান বইবে কেমন করে, অমর্ত্য কোন্ গানে
> ফুল ফুটিয়ে ব্যর্থ করি শীতের তাড়নায়,–
> তুই যদি না শেখাস তবে চলব না আর, না,
> রঙ্গিলা তোর কথার টানে, টানের টানে টানে।

অমর্ত্য গান

> সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই
>
> অসাধারণের গানে
>
> উতলা হয়ো না হয়ো না, তোমার
>
> যা কিছু স্বপ্ন সীমা টানো তার,
>
> তুলে দাও খিল হৃদয়ে, নিখিল
>
> বসুধার সন্ধানে
>
> যেয়ো না, তোমার নেই অধিকার
>
> দুর্লভ তার গানে।
>
> সাধারণ, তুমি সাধারণ, তাই

ছোট আশা ভালবাসা–
তা–ই দিয়ে ছোট হৃদয় ভরাও,
তার বেশি যদি কিছু পেতে চাও
পাবে না, পাবে না, যাকে আজও চেনা
হল না, সর্বনাশা
সেই মায়াবীর গান ভুলে যাও,
ভোলো তার ভালবাসা।

সাধারণ, তুমি সাধারণ, তবু
অসাধারণের গানে
ভুলেছ; পুড়েছে ছোট ছোট আশা,
পুড়েছে তোমার ছোট ভালবাসা,
ছোট হাসি আর ছোট কান্নার
সব স্মৃতি সেই প্রাণে
বুঝি মুছে যায় যে–প্রাণ হারায়
সেই অমর্ত্য গানে।

আকাঙ্ক্ষা তাকে

আকাঙ্ক্ষা তাকে শান্তি দেয়নি,

শান্তির আশা দিয়ে বার বার

লুব্ধ করেছে। লোভ তাকে দূর

দুঃস্থ পাপের পথে টেনে নিয়ে

তবুও সুখের ক্ষুধা মেটায়নি

দিনে দিনে আরও নতুন ক্ষুধার

সৃষ্টি করেছে; সুখলোভাতুর

আশায় দিয়েছে আগুন জ্বালিয়ে।

এই যে আকাশ, আকাশের নীল,

এই যে সুস্থসবল হাওয়ার

আসা–যাওয়া, রূপরঙের মিছিল,

কোনোখানে নেই সান্ত্বনা তার।

বন্ধুরা তাকে যেটুকু দিয়েছে,

শত্রুরা তার সব কেড়ে নিয়ে
কোনো দূরদেশে ছেড়ে দিয়েছিল
কোনো দুর্গম পথে। তারপর
যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে,
শোকের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল
স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর।

একচক্ষু

কী দেখলে তুমি? রৌদ্রকঠিন
হাওয়ার অট্টহাসি
দু’ হাতে ছড়িয়ে দিয়ে নিষ্ঠুর
গ্রীষ্মের প্রেত-সেনা
মাঠে-মাঠে বুঝি ফিরছে? ফিরুক,
তবু তার পাশাপাশি
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী তুমি
একবারও দেখলে না?

একবারও তুমি দেখলে না, তার
বিশীর্ণ মরা ডালে
ছড়িয়ে গিয়েছে নম্র আগুন,
মৃত্যুর সব দেনা
তুচ্ছ সেখানে, নবযৌবনা
কৃষ্ণচূড়ার গালে
ক্ষমার শান্ত লজ্জা কি তুমি
একবারও দেখলে না?

এশিয়া

এখন অস্ফুট আলো। ফিকে ফিকে ছাড়া অন্ধকারে
অরণ্য সমুদ্র হ্রদ, রাত্রির শিশির-শিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন, কঠিন কপাট
ভেঙে পড়ে। দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘরাত্রি মরে যায়, ধসে পড়ে শীর্ণ রাজ্যপাট ;
নির্ভয়ে জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া, রাত্রিশেষ, “ভস্ম অপমান শয্যা” ছাড়,
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসংকোচ রৌদ্রের প্রহারে।

শহরে বন্দরে গঞ্জে, গ্রামাঞ্চলে, ক্ষেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুষ্ঠিবদ্ধ অহ্বান পাঠায় ;

> অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক
> দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপরে
> ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়
> বীত-নিদ্র জনস্রোত বিদ্যুত্-উল্লাসে নেয় বাঁক।

কাঁচ রোদ্দুর, ছায়া অরণ্য

> কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য, হ্রদয়ের স্বপ্ন।
> আকন্ঠ নিস্তেজ তৃপ্তি, ডোরাকাটা ছায়া সরল'–
> বনে-বাদাড়ে শত্রু ঘোরে,
> তাজা রক্ত,–শয়তান অব্যর্থ।
>
> ঝানু আকাশ ঝুঁকে পড়ে অবাক।
> কাঁচা চামড়ার চাবুক হেনে
> ছিঁড়ে টেনে খেলা জমছে:
> এরা কারা, এ কী করছে?
> লোহা-গলানো আগুন জ্বলছে, সাঁড়াছি-
> যন্ত্রণার দুঃস্বপ্ন।
> আপ্রাণ চেষ্টায় জলের উপর রাথা জাগিয়ে
> আকাশ! আকাশ!
> বাতাস টেনে শ্বাসযন্ত্র আড়ষ্ট।

এখন আবার মনে পড়ছে।
প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তভ্রূণ,
শকুন! শকুন!
কয়েকবার পাখ্সাট মেরে ফেল আকাশে উঠল।
করোটি, হাড়পোড়া, ধুলো–
চাপ-চাপ জমাট রক্ত। ছায়ামূর্তি কে দাঁড়িয়ে?
ধুলো, ধুলো। আমি ইয়াসিন,

পুরব-চটির হাটে যাব; লাহেরিডাঙা ছাড়িয়ে
সে কত দূর, সেই এক ভাবনা ঘুরছে।
জল! জল! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।

লোহামুঠিতে
ট্রাক্‌টরের হাতল চেপে তবু কখন ঝিমিয়ে পড়ল মন;
কে গো তুমি মধ্যাহ্নের স্বপ্ন কাড়ো?
আগুন-বাতাসে সূর্য কাঁপে, সন্ধ্যা নামবে কখন।

মস্তিষ্কের নিখুঁত ছাপ উঠল প্লাস্‌টারে।
রাত করেছে, এলোমেলো চিন্তা নিস্পন্দ।
পাহাড়ের শীত-হাওয়ায় চিন্তা নিস্পন্দ।
তারা চলছে। ঘুমিয়ে পথ, যাত্রী।
আকাশ ভিজিয়ে অন্ধকার জ্বলছে,
আর
মরা অরণ্যে হঠাৎ-আগুন-লাগা ফানুসের চাঁদ উঠল,
রাত্রি।

ঢেউ

> এখানে ঢেউ আসে না, ভালবাসে না কেউ, প্রাণে
> কী ব্যথা জ্বলে রাত্রিদিন, মরুকঠিন হাওয়া
> কী ব্যথা হানে জানে না কেউ, জানে না, কাছে পাওয়া
> ঘটে না। এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো
> পোশাকে মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে
> আঁচলে কাচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা;

এখানে মন বড় কৃপণ, এখানে সেই আলো
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ—এখানে থাকব না।

যে-মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে
সেখানে। এরা জানে না কেউ—কী রঙে ঝিলমিল
জীবন,—তাই বাঁচে না কেউ; দুয়ারে এঁটে খিল
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ—দুয়ারে মাথা কোটে,
এখানে মন বড় কৃপণ—এখানে থাকব না।

তৈমুর

রাজপথে ছিন্ন শব, ভগ্নদ্বার প্রাসাদে কুটিরে
নির্জন বীভৎস শান্তি, দলভ্রষ্ট আহত অশ্বের
চকিত খুরের শব্দ, মুমূর্ষুর আর্তকণ্ঠ, ফের
ভৌতিক স্তব্ধতা। শূন্য মসজিদের গম্বুজে খিলানে
রাত্রির নিঃসঙ্গ ছায়া নামে। প্রাণ-যমুনার তীরে
মৃত্যুর উৎসব সাঙ্গম বিহঙ্গ-হৃদয় ছিন্নপাখা।
নগরে গ্রামে ও গঞ্জে মসজিদে মন্দিরে সর্বখানে
দুরন্ত তাতার-দস্যু তৈমুরের পদচিহ্ন আঁকা।

তৈমুর এখানে আসে দস্যুর মতন, জীবনের
কামনাকে হত্যা করে, একটানা অদ্ভুত আহ্বানে
মৃত্যুকে সে ডাকে, তার লোভাতুর অতর্কিত টানে
ছিঁড়ে আসে প্রাণের মৃণাল, ত্রস্ত জীবনের সুর।

> দুরন্ত আঘাতে থেমে যায়–ভয়বিহ্বব মনের
> সমস্ত কপাট বন্ধ, এসে পড়ে কখন তৈমুর।

ধ্বংসের আগে

> তবে ব্যর্থ হোক সব। উৎসব-উজ্জ্বল রজনীর
> সমস্ত সংগীত তবে কেড়ে নাও, নিত্য-সহচর
> ব্যর্থবীর্য শয়তানের আবির্ভাব হোক। তারপর
> পাতালের সর্বনাশা অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে
> দৃঢ় হাতে টেনে দাও যবনিকা। নির্মম অস্থির
> পদক্ষেপে আনো ভয়, বিস্বাদ বেদনা ঢেলে দাও;
> ঢালো গ্লানি, ঢালো মৃত্যু, শিল্পীর বেহালা ভেঙে ফেলে
> অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে অট্টহাসি দু'হাতে ছড়াও।
>
> কেননা আমি তো শিল্পী। যে-মন্ত্রে সমস্ত হাহাকার
> ব্যর্থ হয়। মজ্জামাংস জোড়া লাগে ছিন্নভিন্ন হাড়ে,
> যে-মন্ত্রে উজ্জ্বল রক্ত নেমে আসে অস্থি-র পাহাড়ে
> প্রাণের রক্তিম ফুল ফুটে ওঠে মৃত্যুহীন গাছে,
> সে-মন্ত্র আমার জানা,–তাই মৃত্যু হানো যতবার
> যে জানে প্রাণের মন্ত্র, কতটুকু মৃত্যু তার কাছে।

পূর্বরাগ

আরও কত কাল এ–ভাবে কলম ঠেলতে বলো,

আরও কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা–লেখা খেলতে বলো?

কত কাল, বলো, আরও কত কাল
দূরে থেকে আমি দেখব লুকিয়ে
রাতের প্রগাঢ় পর্দা সরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে সোনালি সকাল,
হিজলের ফ্রেমে ফুটে ওঠে শিশুসূর্যের মুখ?
আলোর স্নিগ্ধ ঘ্রাণে উন্মন দু–একটা ছোট পাখি উড়ে যাউ
মৃদু উৎসুক
চঞ্চল দুটি ছোট পাখা নেড়ে;
মানুষেরা নামে মাঠে। পথেঘাটে বাড়ে কলরব ব্যস্ত হাওয়া।
বাড়ে রোদ্দুর, ডানা ঝাপটিয়ে
তেঁতুলের ডাল থেকে উড়ে যায় লোভী মাছরাঙা,
হঠাৎ ছোঁ মেরে
নীল জলে তোলে ঢেউয়ের কাঁপন,
কাঁপে ঝিরিঝিরি বাতাসের শাড়ি, যেন ঘুমভাঙা
করুণকান্না বেদনার মতো; অলস দুপুর
ধীরে ধীরে চলে গড়িয়ে, ছড়িয়ে
ক্লান্তির সুর।

চেয়ে দ্যাখো মন,

এই ক্লান্তি এ–শ্রান্তিকে ঘিরে আবার কখন
মন–কেড়ে–নেওয়া মায়াবী বিকেল বিছিয়েছে জাল
নিপুণ নেশায়। গেল গেল সব, ভেঙে গেল সন, উল্লাসে ঢালা
এই অরণ্য আবার, আবার; শেষবার বুঝি
ভালবেসে নেবে। শিরীষে শিমূলে কথা চলে, আর
ডালে–ডালে নামে লজ্জার লাল,
লাগে থরোথরো শিহরন, তার
কপালে তীব্র সিঁদুরের জ্বালা
জ্বলে ওঠে। দ্যাখো জ্বলে ওঠে সাদা ঝরোঝরো–শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
তৃতীয়ার তনুতন্বী চাঁদের বঙ্কিম ভুরু
আকাশের কালো হৃদয়ে হঠাৎ।
মাঠে–মাঠে নামে ছায়াছায়া ঘুম, সারারাত ধরে
আধো তন্দ্রার গলিঘুঁজি দিয়ে ম্লান ঝুরুঝুরু
হাওয়া হেঁটে যায়,
শিরশিরে শীতে কাঁপানো হাওয়ায়
চাঁদের তীক্ষ্ণ বঙ্কিম ভুরু কেঁপে ওঠে; যেন এই ধুধু মাঠ
মাঠ নয়, নদী নদী নয়, ঘুম ঘুম নয়, এই
মাঠ–নদী–বন যেন মিছিমিছি শুয়ে আছে, কেউ ফিরে তাকালেই
ডানা ঝাপটিয়ে একসার সাদা বকের মতন

উড়ে যাবে এরা। ভাবি, আর মনে ভয় নামে, নামে ধুধু সাদা ভয়
সারা মন জুড়ে; মায়াবী কপাট
প্রাণপণে ঠেলি, পালাব। কোথায় পালাব? ধবল ছায়াছায়া ভয়
নেমে আসে, আর ম্লান চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে মন,
মনের দীর্ঘ ছায়া বড় হয়!

এই-যে প্রথম সূর্যের সাড়া, উদাস দুপুর,
বিকেলের মধুমালঞ্চমায়া, রাত্রির থরোথরো শিহরণ,
ছায়াছায়া ভয়, ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
বাতাসের ছড়ে টেনে-যাওয়া ম্লান কান্নার সুর,--
বলো, এ কি শুধু নিজেকে লুকিয়ে
শুধু চোখে-দেখা দেখে যাব, আমি সকালের মন, দুপুরের মন,
রাত্রির মন খুঁজে দেখব না? শুধু ফাঁকি দিয়ে
চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে যাব সব?
                                        তা হলে আমি কি
কেউ নই? আমি সকালের নই, দুপুরের নই,
রাত্রিরও নই? তা হলে, তা হলে
এই যে আকাশে প্রগাঢ় সূর্য সারাদিন জ্বলে,
এই-যে রাত্রে লক্ষ হিরার চোখ-ঝিকিমিকি--

আমি তো এদের চিনি না। তা হলে

আরও কত কাল এভাবে কলম ঠেলতে বলো,

আরও কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা–লেখা খেলা খেলতে বলো?

ফুলের স্বর্গ

যৌবনে আনন্দ নেই, যদি তার সমস্ত সম্ভার
আমৃত্যু অক্ষয় থাকে। ক্ষয়ে তার শান্তি, জীবনের
প্রার্থনা পূরণ। এই অপরূপ প্রথম-গ্রীষ্মের
আলস্যের ভারে নম্র আদিগন্ত রৌদ্র-হাওয়া-নীলে
সামান্যই সুখ, দুঃখ অসামান্য : সে-ঐশ্বর্যে তার
শুধু ব্যর্থ সঞ্চয়ের বিড়ম্বনা বাড়ে। এ-যৌবন
রিক্তই না হয় যদি, বঞ্চনায় বাঁচে তিলে তিলে,–
শাস্তিও সান্ত্বনা তার, মৃত্যু তার সন্তাপহরণ।

সে-মৃত্যু যখনই নামে বিদ্যুৎবিদীর্ণ ঘন মেঘে
বৃষ্টির ধারায়, তুচ্ছ যৌবনজড়িমা লজ্জা সব;
প্রাণের সমস্ত পাপড়ি মেলে তার দেবতাদুর্লভ
আলিঙ্গনে সংকোচের বৃন্ত থেকে খসে পড়ে যাওয়া–
সে-ই তো আমার স্বর্গ। প্রত্যাশায় সারারাত্রি জেগে
হাওয়ার হাততালি শুনি; হাওয়া, হাওয়া–অফুরন্ত হাওয়া!

ভয়

যদি এ চোখের জ্যোতি নিভে যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!
দূর পথে ঘুরে ঘুরে ঢের নবীবন
খুঁজে যাকে এই রাতে নিয়ে এলে মন,
এখনও দেখিনি তাকে, দেখিনি, এখন
যদি এ চোখের জ্যোতি নিভে যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!

যে-ও চলে যেতে পারে, যদি যায়, তবে
কী হবে, কী হবে!
এই যে চোখের আলো, ব্যথা-বেদনার
আগুনে রেখেছি তাকে জ্বেলে আমি, তার
দেখা পাওয়া যাবে, তাই। সে যদি আবার
চলে যায়, চোখভরা আলো নিয়ে তবে
কী হবে, কী হবে!

কখনও হারাই প্রাণ, কখনও প্রাণের
থেকেও যে প্রিয়তর, তাকে। সারাদিন
কথা মনে ছিল কোনো মায়াবী গানের,
সুর খুঁজে পেয়ে তার বিষাদমলিন
কথাগুলি যদি ফের ভুলে যাই, তবে
কী হবে, কী হবে!

মেঘডম্বরু

নেই তার রাত্রি, নেই দিন। প্রাণবীণার ঝংকারে
সুরের সহস্র পদ্ম ফুটে ওঠে অতল অশ্রুর
সরোবরে, যন্ত্রণার ঢেউয়ের আঘাতে। সেই সুর

খুঁজে ফিরি রাত্রিদিন। হৃদয়ের বৃন্তে নিরবধি
মুদিতনয়ন পদ্মে যদি না সে শতলক্ষধারে
মন্ত্রবারি ঢালে, তার পাপড়িতে-পাপড়িতে যদি না সে
জেগে থাকে নিষ্পলক তবে সে নিষ্ফল, না-ই যদি
ঝড়ের ঝংকার তোলে এই মেঘডম্বরু আকাশে।

আকাশ স্তম্ভিত। মন গম্ভীর। কখন গুরুগুরু
গানের উদ্দাম ঢেউ সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে
ভেঙে পড়ে! পুঞ্জীভূত মেঘের মৃদঙ্গে পাখোয়াজে
বাজে তার সংগতের বিলম্বিত ধ্বনি। বারে বারে
জীবন লুণ্ঠিত যার, গানে তার উজ্জীবন শুরু;
প্রাণ তার পরিপূর্ণ মন্ত্রময় গানের ঝংকারে।

রৌদ্রের বাগান

কেন আর কান্নার ছায়ায়
অস্ফুট ব্যথার কানে কানে
কথা বলো, বেলা বয়ে যায়,
এসো এই রৌদ্রের বাগানে।

এসো অফুরন্ত হাওয়ায়,–
স্তবকিত সবুজ পাতার
কিশোর মুঠির ফাঁকে ফাঁকে
সারাটা সকাল গায়ে গায়ে
যেখানে টগর জুঁই আর
সূর্যমুখীরা চেয়ে থাকে।

এসো, এই মাঠের উপরে
খানিক সময় বসে থাকি,
এসো, এই রৌদ্রের আগুনে
বিবর্ণ হলুদ হাত রাখি।
এই ধুধু আকাশের ঘরে
এমন নীরব ছলোছলো
করুণাশীতল হাসি শুনে
ঘরে কে ফিরতে চায় বলো।

এই আলো-হাওয়ার সকাল–
শোনো ওগো সুখবিলাসিনী,
কতদিন এখানে আসিনি,
কত হাসি কত গান আশা
দূরে ঠেলে দিয়ে কতকাল
হয়নি তোমায় ভালোবাসা।

> কেন আর কান্নার ছায়ায়
> অস্ফুট ব্যথার কানে কানে
> কথা বলো, বেলা বয়ে যায়,
> এসো এই রৌদ্রের বাগানে।

শিয়রে মৃত্যুর হাত

> শিয়রে মৃত্যুর হাত। সারা ঘরে বিবর্ণ আলোর
>
> স্তব্ধ ভয়। অবসাদ। চেতনার নির্বোধ দেয়ালে
>
> স্তিমিত চিন্তার ছায়া নিবে আসে। রুগ্ণ হাওয়া ঢালে

ন্যাসপাতির বাসী গন্ধ। দরজার আড়ালে কালো–টুপি
যে আছে দাঁড়িয়ে, তার নিষ্পলক চোখ, রাত্রি ভর
হলে সে হারাবে।
সিঁড়ি–অন্ধকারে মাথা ঠুকে ঠুকে
কে যেন উপরে এল অনভিজ্ঞ হাতে চুপিচুপি
ভিজিট চুকিয়ে দিয়ে ম্রিয়মাণ ডাক্তারবাবুকে।

শিয়রে মৃত্যুর হাত। স্তব্ধীভূত সমস্ত কথার
মন্থর আবেগে জমে অস্বস্তির হাওয়া। সারা ঘরে
অপেক্ষা নিঃশব্দ জটলা। যেন রাত্রির জঠরে
মানুষের সব ইচ্ছা–অনিচ্ছা ভাসিয়ে শূন্য সাদা
থমথমে ভয়ের বন্যা ফুলে ওঠে। ওদিকে দরজার
আড়ালে আবছায়া–মূর্তি সারাক্ষণ যে আছে দাঁড়িয়ে,
নিষ্পলক চোখ তার। নিরুচ্চার মায়ামন্ত্রে বাঁধা
ক্লান্তির করুণ জ্যোৎস্না নেমেছে শয্যার পাশ দিয়ে।

শিয়রে মৃত্যুর হাত। জরাজীর্ণ ফুসফুসে কখন

> নিশ্বাস টানার দীর্ঘ যন্ত্রণার ক্লান্তি ধীরে–ধীরে
>
> স্তব্ধ হয়ে গেছে কেউ জানে না তা। ভোরের শিরশিরে
>
> হাওয়ায় জানলার পর্দা কেঁপে উঠে তারপর আবার
>
> শান্ত হয়ে এল। ছায়া অন্ধকার। মাঠ–নদী–বন
>
> পেয়েছে নিদ্রার শান্তি। এদিকে রাত্রির অবসানে
>
> সে–ও নেই। শান্তি! শান্তি! সে চলে গিয়েছে। সঙ্গে তার
>
> কে গেছে জানে না কেউ, শুধু এই অন্ধকার জানে।

শেষ প্রার্থনা

> জীবন যখন রৌদ্র-ঝলোমল,
> উচ্চকিত হাসির জের টেনে,
> অনেক ভালোবাসার কথা জেনে,
> সারাটা দিন দুরন্ত উচ্ছ্বল
> নেশার ঘোরে কাটল। সব আশা
> রাত্রি এলেই আবার কেড়ে নিও,
> অন্ধকারে দু-চোখ ভরে দিও
> আর কিছু নয়, আলোর ভালোবাসা।

স্বপ্ন-কোরক

তবু সে হয়নি শান্ত। দীর্ঘ অমাবস্যার শিয়রে
যে-রাত্রে নিঃশব্দে ঝরে পড়ে
মলিনলাবণ্য স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মমতা,
যে-রাত্রে সমস্ত তুচ্ছ অর্থহীন কথা
গানের মূর্চ্ছনা হয়ে ওঠে,
শোক শান্ত হয়, দুঃখ নিভে আসে, যে-রাত্রে শীতার্ত মন ফোটে
কল্পনার সুন্দর কুসুম, নামে সান্ত্বনার জল
চিন্তার আগুনে, আর আকন্যাকুমারীহিমাচল
কপালে জ্যোৎস্নার পঙ্ক মেখে
জেগে ওঠে অতলান্ত অন্ধকার সমুদ্রের থেকে,–
তখনও দেখলাম তাকে, কী এক অশান্ত আশা নিয়ে
সে খোঁজে রাত্রির পারাপার,
দুই চোখে তার
স্বপ্নের উজ্জ্বলশিখা প্রদীপ জ্বালিয়ে।

সে এক পরম শিল্পী। সংশয়-দ্বিধার অন্ধকারে
সে-ই বারে-বারে
আলোকবর্তিকা জ্বালে, দুঃখ তার পায়ে মাথা কোটে,
তারই তো চুম্বনে ফুল ফোটে,
সে-ই তো প্রাণের বন্যা ঢালে
তুঙ্গভদ্রা, গঙ্গায় কি ভাক্‌রা-নাঙালে।

সে এক আশ্চর্য কবি, পাথরের গায়ে
সে-ই ব্রহ্মকমল ফোটায়।

কী যে নাম, মনে নেই তা তো–
আবদুল রহিম কিংবা শংকর মাহাতো,
অথবা অর্জুন সিং। মাঠে মাঠে প্রদীপ জ্বালিয়ে
সে জাগে সমস্ত রাত স্বপ্নের কোরক হাতে নিয়ে।
আমার সমস্ত সুখ, সকল দুঃখের কাছাকাছি
সে আছে, আমিও তাই আছি।